# যোগেন চৌধুরীর ছবি

## অরুণ সেন

**প্রতিক্ষণ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত বই-এর সংক্ষিপ্ত আকার। এখনও পর্যন্ত যোগেন চৌধুরীর ওপর এইটি একমাত্র বাংলা বই। এই প্রবন্ধ পড়ে কেউ যদি পুরো বইটা পড়তে উৎসাহিত হন তবে তিনি যোগেন চৌধুরীর ছবি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা করতে পারবেন তাতে সন্দেহ নেই।**

শিল্পী যোগেন চৌধুরীর মনে যে-কথাটা এ-সময়ে খুব জোরালো হয়ে দেখা দিল, তা হচ্ছে : এ দেশের মানুষ যেভাবে বসে, দাঁড়ায়, শুয়ে থাকে, তা তো অন্য দেশের মতো নয় কখনোই। ইওরোপীয়রা টানটান করে বসে, আমাদের দেশের বসা-শোয়ার মধ্যে থাকে শিথিলতা। হয়তো গরমের দেশ বলেই তা হয়। কিন্তু যেটা বলবার তা হল, এর মধ্য থেকেই গড়নের একটা স্বাতন্ত্র্য ও নির্দিষ্টতা সম্পর্কে ধারণার জন্ম হয়। আলাদা গড়ন, আলাদা চরিত্র। যোগেন নিজের দেশের মানুষের সেই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ভঙ্গি বা কখনো-কখনো তার মধ্যে যে নাটকীয়তা ব্যক্ত থাকে তাকে ছবিতে আনতে চান।

এবং যোগেন যে সচেতনভাবেই এ-কাজে হাত দিলেন তা বোঝা যায় তাঁর নিজের উক্তি থেকেই।

"মনে হয়, ৮০-৮১-তে আমার ছবির একটা মোড় ফেরা আছে। আগে যে ছবিগুলো করতাম সেখানে মোটাসোটা থলথলে ফিগারই আমার মনোভাবকে প্রতিফলিত করত। এরপর আমি অন্য একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলাম। ভারতীয় একজন মানুষকে আঁকছি, তখন মনে হল, আমাদের ভারতীয়দের বসার ভঙ্গি তো একজন ইওরোপীয়দের থেকে আলাদা, আমাদের শারীরিক গড়ন, চলাফেরা, তাকানোর ভঙ্গি আলাদা। এই আলাদা ব্যাপারটাকে স্টাডি করে আমি ছবির মধ্যে আনতে চাইলাম। আগে এটা এভাবে ঠিক ছিল না। ... হঠাৎ এটা আমাকে আগ্রহী করে তুলল। এ জাতীয় ভারতীয় ফর্মের রিয়েলিটি আমাকে আকৃষ্ট করল। বিদেশীরা যেভাবে ফর্মটাকে ভাঙ্গে তাতে মানুষের ভঙ্গির সঙ্গে যোগ থাকে। একটা ফিগার যখন পশ্চিমি ছবিতে আঁকা হয়, তখন সেই ফিগার কিন্তু তাদেরই মানুষের গড়ন, তাদেরই অভিব্যক্তি, তাদের বসার ভঙ্গি থেকে তৈরি হয়। রাশিয়া বা উওরোপের ছবিতে মানুষের যে চেহারা, চোয়াল বা খুলির যশক্ত গড়ন, তার সঙ্গে আমাদের মানুষের কোনো মিল নেই। আমাদের চেহারা, আমাদের বসার বা দাঁড়ানোর ভঙ্গি আলাদা। আমরা যখন বসি, তখন হাতটাত গুটিয়ে ঝুঁকে বসি। আমার এসব ব্যাপারে বেশ কৌতুহল জন্মাল। আমি তখন এইদিকে তাকিয়ে ধারাবাহিক কাজ শুরু করে দিলাম। তার পরিচয় আমার৮০-৮১-র কাজগুলিতে আছে। সেই সঙ্গে বক্রোক্তি, শ্লেষ, চরিত্রের বৈষম্য—অর্থাৎ একজন মানুষের মুখ একদিক বাঁকা একদিক সোজা—এসব তো থাকেই। এখন এটা আমার নিজের স্বভাবের মধ্যে হয়তো মিশে গিয়েছে।"

অনুসন্ধিৎসার এই মেজাজেই যোগেনের হাত থেকে বেরোয়— 'ম্যান সিটিং অন সোফা''ম্যান সিটিং অন ম্যাট', 'ম্যান সিটিং অন ফ্লোর'। বিভিন্ন মানুষের বসার ভঙ্গি নিয়ে ছোট-ছোট ছবি এঁকে চলেন—'ম্যান ওয়ান', ম্যান টু', ম্যান থ্রি এইভাবে একটি গ্রুপ।

১৯৮০-তে (তাঁর ছবি আঁকার দিক থেকে এটি খুবই উর্বর বছর) মানুষের বসা-দাঁড়ানোর ভঙ্গি নিয়ে ছবি তো আছেই, সেই সঙ্গে আলাদা করে আঁকলেন অজস্র মুখের ছবি—'মুখাবয়ব' বা ' ফেসেস' এই নাম দিয়ে। গোটা মানুষের ছবিতে যেমন, তেমনি এই 'মুখ'-এর ছবিগুলোতেও দেখা যায় কত বিচিত্র ধরনের মানুষকে তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন—বিভিন্ন জীবিকার, বিভিন্ন ক্ষেত্রের, বিভিন্ন পটভূমির। তাদের বসার দাঁড়ানোর উৎকট ভঙ্গি, তাদের অসমঞ্জস অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাদের এলোমেলে ও বিস্রস্ত পোষাক সমেত গোটা শরীরে যেমন, তেমনি তাঁদের চোখে-মুখে চোয়ালে-চিবুকে অনুভবের বিভিন্নতা ফুটে ওঠে। বিদ্রূপে, কৌতুকে, কারুণ্যে, সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ মানবিকতার এক চেনা-অচেনার বিরাট জগৎ। বৈচিত্র্যটাও লক্ষ করার মতো। ১৯৮৪-তে আবার প্রাধান্য পায় মুখায়ব ও পোর্ট্রেট। অজস্র এঁকে চলেন মানুষের ভিন্নভিন্ন ভঙ্গিমা,

চোখেমুখের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। কত রকমের মানুষ—কত তার স্বাতন্ত্র্য, তার রঙ্গ! এ-সময়ে গোঁফ ও দাঁড়িওয়ালা মুখের দিকেই যেন একটু বেশি ঝোঁক । মেয়েদের ছবি আঁকতে গেলেই একটু রং লাগিয়ে দেন। যেমন, 'কালো মেয়ের লাল গাল', 'চিত্রিত শাড়ি পরা মেয়ে', 'শেমিজ পড়া মেয়ে', ' মোটা মেয়ের মুখ' । 'দম্পতি'ও আঁকেন মাঝে মাঝেই দু-একটি করে। ৮৪-র ডিসেম্বরে ইঙ্ক ও প্যাস্টেলে আঁকা 'কাপল-২' যেমন মনে পড়ে। টুপি-পরা তাকিয়ায় ঠেস-দেওয়া স্বামী কুঁকড়ে বসে আছে, তার চোখে ধূর্ততা, আর রমণীর শাড়িতে অজস্র ভাঁজ। কাপড় সরে গিয়ে স্তন বেরিয়ে পড়েছে, চোখেমুখে তার অসহায় আকুলতা, স্বামীর কিন্তু সেদিকে চোখ নেই মন নেই। একই সময়ে প্যাস্টেল -ড্রইং অনেকগুলো— তাতে 'কাপল' আছে, 'গণেশ' আছে, 'জীবজন্তু' আছে— সেই সঙ্গে আছে 'চুল আঁচড়াচ্ছে নারী', বিশ্রাম করছে পুরুষ', 'হামাগুড়ি দিচ্ছে মানুষ' ইত্যাদি। ১৯৮৬-তেও বিচিত্র বিষয়, মানুষ নামক বিষয়েরও বিচিত্রতা—'নর্তকী', 'গর্ভবতী নারী' ( ভূপালের ট্র্যাজিক ঘটনার উপলক্ষে নিবেদিত) , 'নিঃসঙ্গ মেয়ে', 'চিন্তারত মেয়ে', 'গোলাপ হাতে বুড়ো মানুষ', 'উপবিষ্ট বাবু', 'চুল আঁচড়াচ্ছে পুরুষ', 'ক্রন্দনরত শিশু', 'নগ্ন নারী', 'মনস্টারের সামনে বালিকা', 'শরীর এলানো নারী'।

কখনো কখনো মনে হয় কৌতুক বা মজার দিকেই ঝুঁকছেন—মানুষকে দেখার ও দেখানোর এই ভঙ্গিটাই তিনি তুলে নিচ্ছেন। আবার পরক্ষণেই দেখি বিষাদ কীভাবে সবকিছুকে আচ্ছন্ন করছে। সব মিলিয়ে মানুষ—তার বহুধা বৈচিত্র্য, তাকে ঘিরে বাস্তব ও কল্পনা, তার বৈপরীত্য সব নিয়ে যে-মানুষ— তারই চরিত্রশালা যোগেনের বিশ্বে। মানুষের অস্তিত্ব ও তার এইসব বিভিন্ন অভিব্যক্তিরই তো সমন্বয় মানবিক অভিজ্ঞতা। এদের নিয়েই তো তাঁর অনুসন্ধান, তাঁর পর্যবেক্ষণ, তাঁর আবিষ্কার, তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গি।

এই সমন্থিত দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্য পরিচয় পেয়েছি আমরা দিল্লি-পর্বেরই কয়েকটি অবিস্মরণীয় ছবিতে।

১৯৭৫-এ আঁকা 'নটী বিনোদিনী' তার প্রথম উদাহরণ। এই ছবিটিতে রূপবিভঙ্গের দিক আছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে কারুণ্য ও সহানুভূতিকেও চিনে নিতে সময় লাগে না। মিশ্র-মাধ্যমে আঁকা এই ছবিটিতে যোগেনের পরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলি উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়— কাপড়ের ভাঁজ, নকশা-করা সাবেকি ডিজাইনের ব্লাউজ, চোখে বা চুলের বিন্যাসে বা চিবুকে তীব্র অসহায়তা এবং অবাস্তবভাবে প্রকাশ্য স্তনের গঠনে সামাজিক দৃষ্টিতে তার অবস্থান। এই সব কিছু মিলিয়েই নটী। যোগেন এই ছবিটি আঁকার ইতিহাস এবং অনুষঙ্গ বিবৃত করেছেন এইভাবে:

"এর প্রকৃত সূত্রপাত অনেক আগে। ১৯৭০ নাগাদ। আমি এক মহিলার মনগড়া রেখা চিত্র করেছিলাম। ড্রইং। তারপর আমি (নান্দীকার প্রযোজিত) 'নটী বিনোদিনী' থিয়েটার দেখি দিল্লিতে। দিল্লির কালিবাড়ীতে থিয়েটারটা দেখার পর আমি ওই ড্রইংটার ওপর ভিত্তি করেই শুরু করি কাজ। মনটাকে জড়াতে থাকি আমি কাজের সঙ্গে। তারপর একসময় মনে হল এটা নটী বিনোদিনীর মতো। তখনই আমি নাম দিলাম 'নটী বিনোদিনী'। এ ছবিতে কতকগুলো টাইপের বৈশিষ্ট্য আছে। নটী বিনোদিনীর চরিত্র আমাকে খুব ভেতরে-ভেতরে আলোড়িত করে। চরিত্রটি এমনই এক প্রতিভাময়ী বুদ্ধিমতী মহিলার, যিনি নিচু ঘর থেকে এসেছেন এবং চেয়েছেন ওই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার। কিন্তু পারলেন না। তীব্র একটা সমবেদনার বোধ অনুভব করি এই চরিত্রের প্রতি। বস্তুত মেয়েদের ছবি যখনই এঁকেছি, প্রত্যেক সময়ে এই সমবেদনা কাজ করেছে আমার মধ্যে। শুধু এক্ষেত্রেই নয়, মেয়েদের কখনোই বিকৃত করে আঁকতে পারি না আমি। পুরুষ চরিত্রেরই বরং ভীষণ বিকৃতি ঘটিয়েছি। মেয়েদের ক্ষেত্রে বাহ্যত সেই বিকৃতি কিছু ঘটলেও প্রকাশের নানা অভিব্যক্তিতে সহানুভূতিকে চেনা যায়।

এই একই কথা বলা যায় ১৯৭৭-এ আঁকা 'সুন্দরী' ছবিটি সম্পর্কেও। এটি ড্রইং-নির্ভরবা রেখাশ্রয়ী কাজ। একটি নগ্ন নারীর ছবি। মুখটা ঈষৎ বাঁদিকে হেলানো, ডান হাতটা মাথার পেছনে, স্তন দুটির বিন্যাসে তার ছাপ পড়েছে, স্ফীতোদরের আভাস আছে। সমস্ত ভঙ্গিমার মধ্যে একটু নাটকীয়তাও আছে। ইঙ্ক ও প্যাস্টেলের বর্ণপ্রয়োগে ও যথরীতি কাটাকুটিতে ইন্দ্রিয়ঘন শারীরিকতা খুব স্পষ্ট। চোখ দুটিতে নম্র স্থিরতা। 'সুন্দরী'-র নারীকে সুন্দরী বলা যায় কিনা জানি না, কিন্তু তার

প্রতি সহানুভূতি শুধু নয়, আকর্ষণও সঞ্চারিত হয় নিঃসন্দেহে। ফলে মিশ্র অনুভব সহজেই আসে এই ছবিটি দেখতে দেখতে।

"সুন্দরী ছবিতে নিঃশ্চয়ই ডিসটর্শন আছে, কিন্তু তার মধ্যে গ্রেসও আছে। বাংলা পটের প্রভাব আছে, টেরাকোটার লাবণ্যমণ্ডিত ভাস্কর্যমূর্তির প্রভাবও আছে।"

১৯৭৮-এ আঁকা 'প্রিচার' এবং 'চাঁদিনী রাতে বাঘ' ছবি দুটি অবশ্য একটু ভিন্ন জাতের।'প্রিচার' বা 'ধর্মপ্রচারক' ছবিতে ঠাট্টাটাই বোধহয় বড় হয়ে উঠেছে। পেছন থেকে নিরাবরণ ধর্মপ্রচারককে যেভাবে দেখানো হয়েছে—তার বিলীয়মান মুন্ডু, তার বিস্তৃত বেঢপ পিঠ, তার অসামঞ্জস্য হাত দুটির বক্রতা, বিছানার ভাঁজ—এসবের মধ্যে চিত্রগত সমস্যাই শুধু যেভাবে এনে ফেলা হয়েছে, তাতে মনে হয় এর বিষয়হীনতাই শিল্পীর মনোভাব প্রকাশের ধরন। আর বড় আকারের 'চাঁদিনী রাতে বাঘ' ছবির সুররিয়েলিস্ট মেজাজ যোগেনের কাজের বৈচিত্র্য ও সাফল্যকেই নিয়ে আসে না শুধু, যে-বিন্নতার কথা তাঁর অন্যান্য অতিভঙ্গ বিকৃতির ছবিতে নিহিত থাকে, তা-ই যেন উচ্চারিত হয় অন্য ভাষায়। এই ছবির বিষয় নিশ্চয়ই আপাতভাবে অসংলগ্ন: একটি নারী শুয়ে আছে টান টান প্রায় অবয়বহীন হয়ে—মর্দিত স্তনেই হয়তো শুধু নারীত্বের, অসহায় নারীত্বের আভাস। তার ওপর ভাসমান প্রলম্বিত সনখদন্ত ডোরাকাটা হিংস্র বাঘ, অতিশয় জীবন্ত। পাশে একফালি বাঁকা চাঁদ। পেছনে নিশ্ছিদ্র কালো পট। গোটা ছবিতেই এক স্বপ্নময় এবং রহস্যময় এবং হয়তো কিছুটা ভয়ার্ত পরিবেশ ফুটে ওঠে। বৈপরীত্যের এই সরল বিন্যাস, যে-সরলতা রেখাঙ্কন ও সীমিত বর্ণপ্রয়োগে এবং সেই সঙ্গে সমতল দ্বিমাত্রিকতায় স্পষ্ট, তা এমন এক অতিবাস্তব জগতে নিয়ে যায়, যেখানে মানুষি বিপন্নতার রূপককে আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার দরকার হয় না।

দম্পতি, নর ও নারী, বুদ্ধিজীবী, ক্লান্ত অবসন্ন অবসরপ্রাপ্ত মানুষ ইত্যাদি যেমন যোগেনের কাজে বারবার ফিরে-ফিরে আসে, তেমনি তাঁর পুনরাবৃত্ত বিষয় এক-এক কালপর্বে একেকরকম—কখনো জন্তু জানোয়ার, কখনো জন্তুজানোয়ার-সদৃশ নুয়ে-পড়া মানুষ। সেরকমই একটি বিষয় 'গণেশ'। সারা জীবনই, মনে হয়, তিনি যে কতভাবে কত রূপাবয়বে গণেশকে ছবিতে এনেছেন, তা অনুসরণ করাও হবে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। 'গণপতি দি লর্ড' , 'গণপতি দি ওয়ারিয়র', 'গণেশ উইথ ক্রাউন' ইত্যাদি। শুধু 'গণপতি' এই নামেই ছবি আছে অজস্র। প্রত্যেকটিতে ভিন্ন-ভিন্ন জোর পড়েছে, আবার অনেক সময়ে একই ছবিতে নানান অনুভবের সমাবেশ ঘটেছে। রূপগত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই বিষয়গত ও শিল্পগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে।

মিশ্র-মাধ্যমই প্রধান, যার মধ্য দিয়ে যোগেন চৌধুরী বিষয়ের ও রসানুভূতির এই বৈচিত্র ও ঐক্যকে তাঁর নিজস্ব প্রকরণের সমস্যা ও সমাধান হিসেবে নিয়েছেন। এর বাইরেও অবশ্য তিনি নানা মাধ্যমে ছবি যে এঁকেছেন তা আমরা দেখেছি। যেমন, ১৯৭৪-এ অন্তত ১২টি তেলরঙের কাজ তিনি করেছিলেন।

সেখানেও স্বপ্নের ছবি আছে, হয়তো ব্যক্তিগত তাড়নাও (প্রজাপতি, ফল, নারীশরীর বারবার ঘুরেফিরে আসে)—কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক সমাজ-সমালোচনা বা অন্য ধরনের দায়বদ্ধতাও বেশ টের পাওয়া যায়। মানবিক অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি হিসেবেই—কিন্তু তাঁর ছবির বিদেশী অনুরাগী তাঁর নিজের দেশের তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল খুঁজে পান, এমনও হয়েছে। 'লিডার' বা 'নেতা' ছবিতেও যোগেনের সেই প্রত্যাখ্যান কিন্তু তারই পাশাপাশি তিনি আঁকছেন নির্ভার কৌতুকের ছবি—'প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা' কিংবা আয়নার সামনে প্রসাধনরতা এলোকেশী। দুটি ছবিতেই শাড়ীর ভাঁজে, দেহরেখায় কিংবা চোখেমুখে পটের আদল প্রথম ছবিটিতে আছে তদুপরি তাঞ্জোরের কাচ-চিত্রকলার ছায়া।

তা ছাড়া ১৯৭৯-তে যোগেন কিছু লিথোগ্রাফি ও এচিং-এর কাজ করেছেন। ১৯৮২-তে যে ২৩টি জলরঙের কাজ করেছেন, তার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। ইঙ্ক-ড্রইং ও প্যাস্টেল-ড্রইং এর ফাঁকে সবসময়ই করে গেছেন ১৯৮১-তে 'ফ্লাওয়ার স্টাডি' অন্তত ২টি। ১৯৮৪ও ৮৬-তে অনেক প্যাস্টেল-ড্রইং করেছেন, বিচিত্র তার বিষয়—তার কথাও তো হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত এই বিবরণীতেও বোঝা যায়, যোগেনের দিল্লি-পর্বের অফুরন্ত কাজের বিষয়বৈচিত্রে অক্লান্ত জীবনরসের পরিচয় রয়েছে। স্বভাবতই তা শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে ঘটেছে বলেই ছবির উপাদান ও উপকরণগুলি — জমি-বিভাজন, রং-রেখা এবং সবকিছু মিলিয়ে কম্পোজিশনের ভেতরকার টানাপোড়েন—এ সবের মধ্যে শিল্পকর্তৃত্বের অসামান্য নিদর্শন। আশ্চর্য নয় তাই পিকাসো মাতিস থেকে শুরু করে পূর্বাপর পশ্চিমি আধুনিক শিল্পীদের অনেকের বিষয়েই যোগেনের প্রায় অনন্ত আকর্ষণ। তাঁদের অবিশ্রাম দৃষ্টিময় বিস্ময়, বিশ্বের সবকিছুকে জানার ও দেখার আগ্রহ এবং ভাঙাচোরা বাঁকা-সোজা সবকিছুকে দেখানোর ইচ্ছে—এই চারিত্র্য খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হয় এখানে। অথচ তারই মধ্যে বিষয়ের ও প্রকরণের এক ধরনের নির্দিষ্টতা ও নিজস্বতাও গড়ে উঠেছে যোগেনের মধ্যে। তাঁর নিজস্ব ধারাবাহিকতা ও শিল্প-উপার্জন শীর্ষে পৌঁছেছে। দিল্লি-পর্ব সেদিন থেকে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জনেরই পর্ব। যোগেন চৌধুরী বিশ্বভারতীর কলাভবনে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে এলেন ১৯৮৭-র ২৫ ফেব্রুয়ারি। এখনো পর্যন্ত সেই কাজেই যুক্ত আছেন।

শান্তিনিকেতনে আসার পর গোড়ার দিকে বাড়ি খোঁজা, বাড়ি বদল, ক্লাস-ছাত্র ইত্যাদি নিয়ে গুছিয়ে বসা—এই সবেই সময় চলে যাচ্ছিল। মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত। তাই প্রথমে এসে ছবি আঁকার কাজে তেমন মন দিতে পারেননি। এন্ড্রুজ পল্লীতে ছিলেন, ভাড়াবাড়িতে। সেখানে বসে আঁকার জায়গাও ছিল না ভালো। তাই তখন কয়েকটি ছোট-ছোট জলরঙের কাজেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। সংখ্যায় সেগুলো ৮-১০টির বেশি হবে না।

তারপর আস্তে-আস্তে নিজের মিশ্র-মাধ্যমের যে কাজ, সেই ধারাতেই সক্রিয় হলেন। সেটাও ছোট-ছোট কাজ। ওই পরিস্থিতিতে বড় কাজ যখন বিশেষ করতে পারা যাচ্ছে না, তা-ই মেনে নিলেন। তা ছাড়া চলল অনেক ড্রইংয়ের কাজ—প্যাস্টেলে বা কখনো- কখনো তুলিতে। শান্তিনিকেতনে আসার পর-পরই অন্তত শ-খানেক লাইন ড্রইং তিনি করেছেন এইভাবে।

ইঙ্ক ও প্যাস্টেলের সমবায়ে মিশ্র-মাধ্যমের যে ছবি, তা আঁকা তো চলছেই। ১৯৮৭ ও ৮৮-তে 'নারী ও পুরুষ' নামাঙ্কিত অজস্র ছবি, তিনি আঁকলেন— কোনোটা শুধু বহুবর্ণ প্যাস্টেলে, কোনোটা ইঙ্ক ও প্যাস্টেলে। তখন কিন্তু তাদের আর 'দম্পতি' এই নাম সব সময় দিচ্ছেন না—বলছেন 'নারী ও পুরুষ'। পাশাপাশি 'নারী ও পাখি', 'নারী ও চেয়ার' ইত্যাদি।

যোগেন চৌধুরী আস্তে-আস্তে শান্তিনিকেতনের জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। রতন পল্লীতে ভালো বাড়ি ভাড়া পেয়েছেন এবং পরবর্তী কালে সে-এলাকাতে নিজের বাড়ি বানিয়েছেন। সেখানে ছবি আঁকার অঢেল জায়গা। শান্তিনিকেতনে এসে সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কলাভবনে প্রায়ই দেখা হয় সোমনাথ হোর, কে জি সুব্রহ্মনিয়ম, ঋতেন মজুমদার ও দিনকর কৌশিকের সঙ্গে।

"শান্তিনিকেতনে কলাভবনে নানা কাজে ব্যস্ততায় এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাটে। মাঝে-মাঝে চীনে বটতলায় শিক্ষকদের বেশ আড্ডা জমে। কী করে সময় কেটে যায় খেয়াল থাকে না।"

শান্তিনিকেতনে আঁকা ছবিতে সূক্ষ্ম পরিবর্তনও দেখা যায় নানাদিক থেকে। আমরা তো জানি, যোগেনের ছবির একটা প্রধান লক্ষণ ছিল "এক্সপ্রেশনিস্ট ছন্দোময়তা এবং ইন্দ্রিয়গোচর অতিভঙ্গ বিকৃতি, বিশেষত ওজন সমেত মানুষের ধড়কে ভেঙে-দুমড়ে-মুচড়ে ফেলার ঝোঁক।" তাতে ক্রমশই একটা রূপান্তর ঘটতে থাকল। ওই জোরালো বিকৃতির পেছনেও সময়ের একটা চাপ ছিল, শিল্পের যাথার্থ্য ছিল, কিন্তু ক্রমশই, হয়তো দিল্লি-পর্বের শেষ থেকেই এবং শান্তিনিকেতন-পর্বে পুরোপুরিভাবে তাঁর মনে হল, যে-কোনো মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় আচার-আচরণ-জনিত ভঙ্গিমার মধ্যে যে সহজ ভাব থাকে, তা নিয়ে আসা যায় কিনা। এখানেও মানুষের চিত্রণে আগের যুগের যে রূপবিকৃতি ছিল তা দূর হয়ে গেল এমন নয়, বস্তুত আগের সঙ্গে একটা ধারাবাহিকতার যোগ রইলই, কিন্তু সেই ভঙ্গুরতা যেন এবার অনেকটাই কমে গেল, অনেক সহজ হয়ে এল। ফলে, ছবি যেন বাস্তবকে আরো সোজাসুজি ছুঁতে পারল। বাস্তবতা তাঁর ছবিতে কখনোই লঙ্ঘিত হয় না। কিন্তু এবার যেন তার মধ্যে একটু অন্য সুর লাগল। একজন মানুষের এক-একটা চকিত ভঙ্গি সামান্য অঙ্গ-সঞ্চালনের মধ্যে—যেমন, চুল আঁচড়ানো, একটু মুখ ফেরানো, একটু বেঁকে বসা ইত্যাদিতে যে স্বাভাবিক নাটকীয়তা থাকে, তাকে আনার দিকে

নজর পড়ল। আগের যুগে যে নাটকীয়তার অতিরেক ছিল, তার জায়গায় এল এখন সুক্ষ্ম মৃদু অর্ন্তমুখী নাটকীয়তা। এদিকে তাঁর খুব ঝোঁক। এর মধ্যে সামান্য আলংকারিকতার যে দিক আছে, তাতেও। পরবর্তীকালে এই নাটকীয়তা সঞ্চারের মধ্যে হয়তো একটা মানসিক অস্থিরতার ব্যাপারও ছিল। শুদ্ধ ফর্মের বিশ্বস্ততা থেকে বেরিয়ে এসে যখন তিনি স্বাধীনভাবে আঁকা শুরু করলেন, তখন তো সেই অস্থিরতা থাকবেই। এরকমই একটা প্রাণাবেগ থেকে লাইনের জোর এসে পড়ে তাঁর ছবিতে। বাস্তবের রিদম্ বা ছন্দঃস্পন্দ থেকে এক্সপ্রেশনিস্ট রিদ্‌ম বা ছন্দঃস্পন্দ—এইভাবেই। তাতে মানবিক অভিব্যক্তির স্ফুরণ ঘটাবার যেমন দরকার হয়, তেমনি তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকে ওই রেখা-রং ইত্যাদি ব্যবহারের শিল্পগত দাবি। সেটা না হলে তো ছবিই হবে না। ড্রইংয়ে তো শুধু রেখার ওপরই নির্ভর, পেইন্টিং-এর বাস্তবে অন্য অনেক কিছুই থাকে । তাই ড্রইংয়ে রেখা ব্যবহার করতে-করতে ছেড়ে যাওয়া চলে, কিন্তু পেইন্টিংয়ে সম্ভবত ততখানি চলে না সবসময়, রং-রেখা ইত্যাদির টানাপোড়েন না থাকলে সবকিছু ভেস্তে যায়।

ফলে, আগের যুগের দলানো-মোচড়ানোর ভঙ্গুরতার মধ্যে প্রবলতার ধরন ছবির রূপগত বিন্যাসের যে পরিচয় ছিল, মৌলিকভাবে স্বস্থানে থেকেও এখন তার সচেতন সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটল। সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্তন যেটুকু, তার পেছনে প্রবল বিকৃতি বা ভাঙচুরের বিষয়গত অভিজ্ঞতার যেমন, তেমনি রূপগত লক্ষণের ধারাবাহিকতাও বজায় রইল।

আরেকটা নতুন ব্যাপার ঘটল। আগে, বিশেষত দিল্লি-পর্বে যেখানে পটভূমিতে ফ্ল্যাট রং ব্যবহার করতেন যোগেন, বিশেষত কালো রং—এখন সেখানে অনেক রং এল, রঙিন বুনট বা টেক্‌সচার এল। শান্তিনিকেতনে এসে ছবি অনেক সময়ই বহুবর্ণ হয়েই উঠল।

যোগেন শান্তিনিকেতন-পর্বেই আবার ব্যপকভাবে গাছ, লতাপাতা ইত্যাদি নিয়ে এলেন, প্রধানত ড্রইংয়ে, কখনো-কখনো পেইন্টিংয়েও। এর আগে মাঝে-মাঝে প্রকৃতি আসেনি তা নয়, কিন্তু মানুষই প্রধান—তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অভিব্যক্তি নিয়ে। কিন্তু, এখানে যখন তিনি সরাসরি রীতিবিন্যস্ত প্রকৃতিকে নিয়ে এলেন তাঁর শিল্পকর্মে, তখন তাতে দেখা গেল, মানুষ-আঁকার অভিজ্ঞতাও যেন তাঁকে প্রভাবিত করছে। অবশ্য, উলটো করেও বলা যায়, আগেই, লতাপাতা থেকেই হয়তো মানুষের ভারগ্রস্ত নুয়ে-পড়া ফর্ম এসেছে। গাছ-ফুল-লতাপাতা সম্পর্কে তাঁর কৈশোরক আগ্রহের কথা তো আমরা জানিই—পরে নানা কারণে মানুষের থিমই তাঁর ছবির বিষয়কে অধিকার করে থাকলেও সেই প্রাকৃতিক অনুভব তো লুপ্ত হয়ে যায়নি, হয়তো এভাবেই থেকে গেছে। আবার মাঝখানের মানুষ-সংক্রান্ত চর্চা তাঁর সাম্প্রতিক প্রকৃতি-চিত্রকেও আক্রান্ত করেছে এমনও হতে পারে। তাই তাঁর ড্রইংয়ে দেখি, ফুলদানি থেকে ফুল-লতা-পাতা বেরিয়ে কীভাবে নুয়ে পড়েছে জড়িয়ে থেকেছে, বিনাশের দিকে ধাবিত হয়েছে। তাঁর বিকারগ্রস্ত মানবমূর্তিতে যেমন ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়দিকই আছে, নৈরাশ্য ও ব্যঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গে মাধুর্য বা গ্রেস—তেমনি তাঁর ফুল-গাছ-লতাপাতা বিনাশের আভাস যেমন আছে, তেমনি আছে লালিত্য। স্থূল রেখার মধ্যে যেমন বেপরোয়া বিকার, তেমনি লিরিক্যাল মেজাজ।

যোগেনের ছবিতে, আমরা দেখেছি, স্বপ্ন হানা দিয়েছে মাদ্রাজ-পর্ব থেকেই, বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর। তখন অবশ্য অবচেতনের একটা জটই বড় হয়ে উঠেছিল।

স্বপ্নের স্মৃতি তাঁর ছবিতে সবসময় ঘুরেফিরে আসে। কারণ স্বপ্নের তো কোনো সীমারেখা নেই—নানা দিক থেকেই তা আচ্ছন্ন করতে পারে কল্পনাপ্রবণ মানুষকে। স্বপ্নের সঙ্গে যেমন অবদমিত জগতের সম্পর্ক আছে, তেমনি আছে পাখা-মেলা কল্পনার বা কল্পজগতের সম্পর্ক।

স্বভাবতই যোগেনের ছবিতে বাস্তবের সঙ্গে-সঙ্গে কল্পনারও একটা প্রধান স্থান আছে অবশ্যই। এমনকী যে-কল্পনা ফ্যান্টাসি বা সুররিয়েলিজ্‌মের দিকে নিয়ে যায়, সেটাও তাঁর ছবির একটা বড় ধর্ম। ফ্যান্টাসি আর সুররিয়েলিজ্‌ম খুব কাছাকাছি এবং তারা উভয়ই বাস্তবকে ছাড়িয়ে গেলেও গভীরতর অর্থে বাস্তবের বিরোধী নয়। বরং বলা যায়, রিয়েলিজ্‌মেরই সম্প্রসারণ সুররিয়েলিজ্‌ম।

আক্ষরিকভাবে বলতে গেলে তো প্রত্যেক শিল্পেই রিয়েলিজ্‌ম এবং সুররিয়েলিজ্‌মের উপাদান কোনো কোনো ভাবে

থাকেই। বাস্তব বা রিয়েলিজ্‌ম (ন্যাচারালিজ্‌ম নয়) যেমন কেউ এড়াতে পারে না (চূড়ান্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ছাড়া), তেমনি অবিকল রূপায়ণ যেহেতু শিল্পে কখনোই লক্ষ্য নয়, তাই যে প্রতিমাগুলো শিল্পীর হাত থেকে বেরিয়ে আসে, তার মধ্যে শিল্পী-নির্দেশিত অসংবদ্ধতার বীজ সবসময়ই থাকতে পারে। যোগেনের ছবিতে বাস্তবকে প্রকাশ করতে গিয়ে যেমন ডিসটর্শন বা ভাঙচুঁর ঘটেছে, তেমনি ফ্যান্টাসি বা সুররিয়েলিজমের প্রকাশেও সেই ডিটর্শন বা ভাঙচুর দেখেছি। (শৈলীর এই সাধারণ্য ও প্রকাশ্যতার মধ্য দিয়েই বাস্তবকে প্রকাশ করতে গিয়ে যেমন ডিসটর্শন বা ভাঙুর দেখেছি।) শৈলীর এই সাধারণ্য ও প্রকাশ্যতার মধ্য দিয়েই বাস্তব ও পরাবাস্তব যে একই চেতনা থেকে জন্ম নিতে পারে, তাঁর ছবিতে সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সুররিয়েলিজ্‌ম বুঝি বাস্তবের নিয়মকানুনকে, সংলগ্নতা বা যুক্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। এ সব অনেক পুরোনো কথা। এখন আমরা জানি, সংলগ্নতা বা যুক্তি বা বাস্তবের যে গড়ন ব্যবহারিক জীবনে বা তত্ত্বজগতে স্বীকৃত, তা শিল্পসাহিত্যে নাও থাকতে পারে— সেখানে তাদের গড়ন অনেকসময়েই আলাদা হয়ে যায়। যাকে মনে করা হত অযুক্তি বা অর্থহীন, তারও আছে অন্যতর গভীর কোনো যুক্তি বা অর্থ। যুক্তির প্রচলিত শৃঙ্খলকে ভাঙার মানে তো যুক্তিকে ভাঙা নয়।

সুতরাং, সুররিয়েলিজ্‌মের অভিঘাতে বাস্তব অগ্রাহ্য হল এমন মনে করার কারণ নেই, বরং বলা যায়, অন্য একটা মাত্রা তৈরি হল, অন্য একটা দরজা খুলে গেল। তাই তো সাহিত্য, শিল্পকলায়, চলচ্চিত্রে তার প্রভাব এত বেশি পড়েছে। মহৎ শিল্পের এটা একটা অবলম্বন হয়ে উঠেছে অনেকসময়ই। আজকাল ম্যাজিক-রিয়েলিজ্‌মের যে-কথা বলা হয়, তার সংজ্ঞার্থ যাইহোক, সেও তো একরকম সুররিয়েলিজ্‌মেরই দোসর—রিয়েলিজ্‌মের জমিতেই ফ্যান্টাসির আবহ গড়ে তোলা।

দিল্লি পর্ব থেকেই দেখি, যোগেনের ছবিতে শুধু নির্জ্ঞান মনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই নয়, সচেতন পরিকল্পনায় পরাবাস্তব একটা জগৎ নির্মিত হতে চাইছে— বিষয়ের মধ্যে আপাতভাবে অসামঞ্জস্য তৈরি হচ্ছে, চিত্রপ্রতিমাগুলো অনেকসময়ই প্রকাশ্য যুক্তির বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ আলাদা করে তাদের প্রচলিত রূপাবয়ব ও প্রকরণবৈশিষ্ট্য নিয়েই কিন্তু তারা দাঁড়িয়ে আছে। এই লক্ষণ আরো স্পষ্ট হয় শান্তিনিকেতন-পর্বে এবং সাম্প্রতিকতর ছবিগুলিতে। ক্রমশ মনে হয়, তাঁর সব ছবিতেই ফ্যান্টাসির ছোঁয়া থাকছে, যেমন তাঁর সব ছবিতে বাস্তবের চাপও আছে একই সঙ্গে।

তাই ১৯৯৪ ও ৯৫ সালে অঙ্কিত বেশ কয়েকটি ছবি, যেগুলি সিমা গ্যালারি-তে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছিল, সেখানে দেখি তাঁর ছবিগুলো তাঁর নিজের অন্য ছবির সঙ্গে প্রায় একই সুরে গাঁথা। আসলে প্রতিমাগুলোকে আপাত অবাস্তব সমাবেশে বা সমন্বয়ে যুক্ত করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছবির বৈশিষ্ট্য হিসেবে ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তবু তার মধ্যে বাস্তবের একটা গড়ন সবসময়ই বজায় থাকছে। আলাদা করে ফ্যান্টাসি বা সুররিয়েলিস্টিক ছবি হিসেবে হয়তো চিহ্নিত করা যায় সেগুলোকেই যেগুলোতে সেই গড়ন সচেতনভাবে শিল্পী লঙ্ঘন করেছেন। সবগুলোই ইঙ্ক ও প্যাস্টেলে তাঁর ওই মিশ্র মাধ্যমে আঁকা। এর মধ্যে 'স্টিল লাইফ'-এ দেখি — ফুল বা পাতার গঠনে, রঙের সমাবেশে বা রেখার বুনটের তারতম্যে, কিংবা 'সোয়ান অ্যান্ড লোটাস-লাভ' ছবির অবাস্তব বিষয় বিন্যাসে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করাই লক্ষ্য। অথচ সেই খেয়ালি কল্পনা থেকেই বেরিয়ে আসছে অন্য-এক সমন্বয়ের সুষমা। সে-সুষমা শুধু রেখা-রং ও জমি-ভরাটের নৈপুণ্যেই নয় কল্পনার বিস্তারেও। ওই সময়ের আঁকা যথাক্রমে 'চন্দ্রালোকিত রাত্রি' শিরোনামে এক ও দুই সংখ্যক ছবিতে দেখি সুররিয়েলিস্ট ছবির পূর্ণাভাস। একটিতে ফুটে উঠেছে শ্বেতবসনা দুই নারীর বৈষম্য—একজন যেন সব ত্যাগ করে কোথায় চলে যাচ্ছে, চাঁদের দিকেও দৃষ্টি নেই; অন্যজনের মাথার ওপর হাত রাখার ভঙ্গিতে, উড়ে-যাওয়া আঁচলে, শাড়ির ভাঁজে এক ধরনের আসক্তির প্রকাশ— এরকমই হয়তো ভাবা যায়। কিন্তু ব্যাখ্যাহীন তাদের উপস্থিতিতে যে টেনশন ধরা পড়ে, তারই অভিব্যক্তি যেন বাস্তবে-অবাস্তবে বিন্যস্ত দু-টুকরো মেঘ। দুই-সংখ্যক ছবিতে দেখি আরেক শ্বেতবসনা চুল মেলে দিয়ে নতমুখী, নগ্ন গাত্র বেঢপ পুরুষটি নতজানু, চোখ বিস্ফারিত ও অনুতপ্ত— এই অসম্ভব সমাবেশে মেনে-নেওয়ার বা আত্মসমর্পণের একটা ভঙ্গিই বেরিয়ে আসে। আকাশে অতি-আলোকিত চাঁদ ও উড়ন্ত পাখি ও ঘাড়-বাঁকানো শাদা ঘোড়া যেন ঠিক তার বিপরীত। 'স্ট্রিট লাভার্স' বা 'রাস্তার প্রেমিকেরা' ছবিতে দেখি তিনজন উদোম-গা পুরুষই ভিন্ন-ভিন্ন কাজে

নিয়োজিত, তাদের কারোর সঙ্গেই কারোর সম্পর্ক নেই। এর মধ্যে একজনের অনিচ্ছুক শ্বেতবসনাকে হাত-ছোঁয়া আহ্বান খুবই বেমানান বাস্তব। এখানেও সঞ্চরমান দু-খণ্ড মেঘ সেই বৈপরীত্যের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে। সব কটি ছবিতেই কালো পটের বুনটে রহস্যময়তা ঘনীভূত। অথচ, অন্য-এক দিক থেকে প্রতিটি প্রতিমাই বাস্তব এবং আমাদের খুব চেনা-জানা। 'হলুদ ছুরি' ছবিটির বাস্তবও তা-ই। অথচ শুধু ছুরির ওই হলুদ রং এবং উদ্যত ঘাতকের সারা শরীরের টেক্‌সচার অশরীরী রহস্যময়তা এনে দেয়। মনে হয়, আমাদের চেনা ঘাতকই গ্রাস করেছে জগৎ চরাচর। তার শরীরে কাঁধ-উঁচু গড়নে, জ্বলন্ত চোখে ছড়ানো সেই হিংস্রতা যা চারদিকে পরিব্যাপ্ত। ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটের সঙ্গে এই অনুভবের যে সম্পর্ক তা দর্শককে একটা বড় জগতের দিক নিয়ে যায়।

ফ্যান্টাসি বা সুররিয়েলিজ্‌ম আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পসাহিত্যে বহুচর্চিত এক দর্শন। কিন্তু যোগেনের মধ্যে এই লক্ষণ এতই স্বাভাবিক তাঁর নিজস্ব ধারাবাহিকতায় এসেছে যে তার জন্য তাঁকে কোনো দালি বা মিরো-র পথ নিতে হয়নি, ভারতীয় নন্দনেই ফ্যান্টাসি ও রিয়েলিটির যে কল্পনাদীপ্ত মিশ্রণের ঐতিহ্য আছে, তা-ই ছিল তাঁর পক্ষে আদর্শ হিসেবে অনেকখানি।

এই সময়ে, বিশেষত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে (১৯৯৪) তেলরঙে মনোনিবেশ করেছেন যোগেন। তেলরঙের কাজ তিনি যেমন বেশি করেননি এটা ঠিক, তেমনি একেবারে ছেড়েও দেননি কখনো। মাঝে-মাঝেই হাত দিয়েছেন। এটা এক ধরণের বিরাম-বিশ্রাম। যোগেন তাঁর নিজের মিশ্র-মাধ্যমে কাজ করতে-করতে কিংবা ড্রইংয়ে দীর্ঘকাল লিপ্ত থাকতে-থাকতে, খানিকটা বৈচিত্রেরই কারণেই যেন তাতে হাত দেন। কিন্তু তেলরঙে পুরোপুরি মনোনিবেশ করে আঁকার ইচ্ছেটা তাঁর সবসময় থাকে, মিশ্র-মাধ্যমে কাজ করতে-করতেও মনে আসে। কিন্তু হয়ে ওঠে না।

তেলরঙের কাজেও অবশ্য থিমের দিক থেকে মিশ্র-মাধ্যমে আঁকা ছবি বা ড্রইংয়ের সামীপ্য থাকেই, তবে এও ঠিক, মাধ্যমগত পরিবর্তনের ফলে ছবির চরিত্রের একটা বদল তো হবেই। সম্প্রতি প্যারিসে যে তেলরঙের ছবি পাঠানো হয়েছিল সেগুলো খানিকটা যেন অমনোযোগে আঁকা—তাই সেগুলো সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ সীমিত। তবু আমাদের কাছে তাদের বৈশিষ্ট্য নজর এড়ায় না। রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতির মানচিত্রে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বের অভিঘাত তাঁর এই ছবিগুলোতে খুবই আছে বলে মনে হয়। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ছাড়িয়ে ব্যক্তিমানুষের, নারী ও পুরুষের, পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনেরও রূপক হয়ে ওঠে তারা। জন্তুর মতো মানুষ এখানে দৃশ্যপট জুড়ে আছে। তিনি যাদের আঘাত করতে চান সেই 'ক্ষমতাবান' মানুষ যেমন তেমনি অসহায় আহত মানুষ যাদের সম্পর্কে তাঁর সহমর্মিতা আজও। এরকম কিছু ড্রইং তো তিনি আগেই করেছেন। এখানেও মানুষের মুখ ভাঙা-বাঁকা, মাথার খুলি বেঢপ, তারা হামাগুড়ি দিচ্ছে, ছোট-ছোট তাদের পা। একটা ছবিতে দেখি মানুষ শুধু শুয়ে আছে। তার সঙ্গে তিনি অন্য চিত্র-উপাদান জুড়ে দিলেন। নিজের মতো করে রং, টেক্‌সচার দেন। নিজে যেভাবে গড়তে চান, মানুষের গড়ন তা-ই। এভাবেই যেন ছবির নিয়মকানুনের মধ্যেই বিষয়গুলি বেড়ে উঠতে থাকে। তেলরঙে তা-ই হয়। মূল ড্রইং, মূল পরিকল্পনা বদলে-বদলে যায়, কল্পনার স্ফূর্তি ঘটে। এরকম আরেকটা ছবিতে: দম্পতি শুয়ে আছে— পুরুষের বিকারগ্রস্ত শরীর, তার পাশে নির্বিকার মহিলা। উজ্জ্বল ফ্ল্যাট রঙে সমাচ্ছন্ন পরিবেশ।

লক্ষণীয়, শেষোক্ত এই ছবিতেই শুধু নয়, তেলরঙের আরো কোনো-কোনো ছবিতে, বিভিন্ন পর্বে আঁকা মিশ্র-মাধ্যমের বহু ছবিতেই বাংলা পটের আদলকে বেশ চেনা যায়। তেলরঙের একটি ছবিতে দেখি: এক মহিলা একটি পদ্মফুল ধরে আছে, মাথার দিকটা ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে, নীচের দিকটা বড়। কাপড় পরা, শাড়ীতে অনেক ভাঁজ অনেক অলংকরণ। মুখটা একটু ঘোরানো। এখানে আকার সামান্য ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চোখগুলো খুব বড়-বড়। একেবারে পটের ছবির চোখ। মনে হয়, যোগেন এভাবেই চেষ্টা করেছেন বাস্তব ও অবাস্তবকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে। এমনকী এও দেখা যায়, দুটি মানুষ হয়তো একসঙ্গে আছে—একজনের চেহারা একটু ডেকরেটিভ বা আলংকারিক, অন্যজনের রিয়েলিস্টিক। কোনো ছবিতে মেয়েটির চোখ হয়তো পটের মতো বড়-বড়, আর তার পাশে ছেলেটির চোখ ছোট, খাঁটি বাস্তবোচিত। কিংবা একটি মেয়ের ছবি আঁকেন একেবারে ত্রিমাত্রার রিয়েলিস্টিক ধাঁচে, কিন্তু চোখটা ফ্ল্যাট, পটের যেমন। এর মধ্যে যোগেনের চেষ্টা বৈপরীত্যের মধ্য দিয়েই সংঘাত তৈরি করা। এই দ্বন্দ্ব তাঁর ছবিতে একটা মোচড় এনে দেয়, টেনশন সৃষ্টি করে। হয়তো মায়াজড়ানো

একটা স্পর্শও পাওয়া যায়। কবিতায় যেমন দেখি, একেবারে আধুনিক শব্দের পাশে প্রাচীন শব্দ কী অসামান্য অভিঘাত সৃষ্টি করে।

ছবি আঁকার বিষয় ও রূপে এই যে বৈপরীত্যের টেনশন সেটাই মনে হয় যোগেন চৌধুরীর শিল্পকর্মে ধারাবাহিক ও সামগ্রিক। একসময় অতিভঙ্গ বিকৃতির মধ্য দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার উৎসে ছিল পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কিন্তু ক্রমশ টের পাই তাতে সঞ্চারিত হচ্ছে জীবন ও জগতের প্রতি কৌতূহলী আকর্ষণ ও মমতাও। বিকৃতির ধার আস্তে-আস্তে কমে যায়, কিন্তু প্রকরণের স্বভাবে সেই অভিজ্ঞতা নিহিত থাকে। শান্তিনিকেতন-পর্বে এসে তার একটা পূর্ণতর ভারসাম্য রচনাতেই তিনি উদ্‌গ্রীব।

যে সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবেশে একজন শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম করেন কিংবা শিল্পী হিসেবে, তার ঘাতপ্রতিঘাতে বেড়ে ওঠেন, সেটা নিশ্চয়ই শিল্পীর সত্তাপরিচয়ে সব নয়, কিন্তু অনেকখানি এবং মৌলিক। শিল্পীর শৈলী নির্মাণেও তার ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কতখানি থাকে তা আমরা দেখেছি।

যোগেনের কাছে সেই পরিবেশ যেমন কলকাতার এবং বাংলার, তেমনি ভারতের এবং অনেকখানি বিশ্বেরও। তিনি কী দেখেছেন সেই পরিবেশে? পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি যখন তিনি আর্ট কলেজে ভরতি হলেন, কিংবা তারও আগে কৈশোরে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বছরটিতে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এলেন, সেই সময়ে বলাই বাহুল্য স্বাধীনতা-পরবর্তী স্বদেশের বাস্তব তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে একান্তভাবে জড়িয়ে ছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে দাঙ্গার ক্ষত দগদগ করছে। দরিদ্র নিরন্ন মানুষ তখন আর পরাধীন দেশের মানুষ নয়, স্বাধীন দেশের নাগরিক। তাদের হাড়-জিরজিরে শরীরের পাশে কিছু মানুষের ধন বাড়ছে, মেদ ও ভুঁড়ি বাড়ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যটা স্বাধীন দেশে চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ঘটছে। চিন্তার এক ধরনের দীপ্তিও উদ্ভাসিত হচ্ছে কিছু মানুষের চোখে-মুখে।

যোগেন, আমরা জানি, সপরিবার বাস্তুহারা হয়ে এদেশে এসেছেন। সংকীর্ণ ও হতশ্রী কলোনির মধ্যে থেকেছেন। দেশভাগের দুঃখময় স্মৃতি তাঁকে নিশ্চয়ই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অর্থনৈতিক দারিদ্রের কথা তাঁর মুখে বারবার শুনেছি। এই দুঃখ ও দারিদ্রের অভিজ্ঞতার স্মৃতি যোগেনকে ছেড়ে যায়নি কখনো। তাঁর আঙ্গিকগত প্রকরণের নানা বৈশিষ্ট্যের পেছনে কিংবা তাঁর চিত্রশৈলীর গড়নে এই অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল বলে অনেকেই মনে করেছেন, যোগেন নিজেও করেন।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বভাবে তিনি এই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সঙ্গে সংযোগ রেখে গেছেন তাও দেখেছি—নিজের পাড়া থেকে শুরু করে বৃহত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে থেকেছেন। এমনকী প্রত্যক্ষভাবে না হলেও রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এবং অন্তত মানসিক সংযোগও তৈরি হয়েছিল। এর প্রশ্রয় ছিল বাড়িতে, পাড়ায়, বন্ধুবান্ধবদের জগতে। আর এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর চেনা মানুষের বিকৃতি কেন তাঁর শৈলীকেও গ্রাস করেছিল। তিনি তো দেখেছেন এই বৈপরীত্যের স্বদেশে সুবিধাভোগী মানুষ কী উৎকট ও বীভৎস মুনাফা অর্জন করেছে, কীভাবে মানুষের শরীরের ছন্দহীন স্ফীতি তার রূপক হয়ে উঠেছে। যোগেনের স্থায়ী ও জোরালো চিত্রভাষা সেই বাস্তবের অনুভবকেই এনে ফেলেছে চোখের সামনে। এ-ই তাঁর সমালোচনা, তাঁর প্রতিবাদ, সমাজ বিষয়ে তাঁর লিপ্ততা। জোরদার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সময়ে তাঁর নিজের মতো করে অংশগ্রহণ। নেতির আত্মসচেতনতার মধ্য দিয়ে মুক্তির স্বপ্ন দেখা।

ইতিমধ্যে ষাটের দশকের শুরু থেকেই দেখেছি সেই মুক্তির স্বপ্নে কীভাবে চিড় ধরছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভেদ থেকে আরম্ভ করে তার বিপর্যয় পর্যন্ত শুধু ক্ষয়েরই ইতিহাস। তার বাইরে দেশের যে পরিস্থিতি সেখানেও শুধু অবসাদ ও ব্যর্থতা। ১৯৬৮-তে বিদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি দেখলেন: "কলকাতার অবস্থা তখন অত্যন্ত ম্লান, বিধ্বস্ত। ইতিমধ্যে নকশাল আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে এবং একটি বড় রকমের দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে সারা দেশ জুড়ে। তার কালো ছায়া সমস্ত মানুষজন শহরের রাস্তাঘাটের চেহারায় স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। দেশে পৌঁছে মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল।" এইরকম পরিস্থিতিতে

শিল্পী শুধুই ব্যক্তিগতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন, অন্তত কিছুকাল, তাতে আর আশ্চর্য কী।

রাজধানীতে, যে-ক্ষয় তিনি দেখছিলেন, তা আরো স্থূল, আরো নীচ, এবং প্রতিবাদহীন। টাকার খেলা এখানে আরো বেশি নির্লজ্জ, শাসকশক্তির ভ্রুকুটি আরো নির্মম। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির দলাদলি ন্যক্কারজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। ক্রমশ দেখা যাচ্ছে, শুধু দলীয় বিভেদ নয়, সেই ক্ষয় গ্রাস করছে বামপন্থী রাজনীতি ও ভাবনাকেও। সমাজের সর্বত্র ঘুণ লেগেছে। নীতিবোধ প্রায় লুপ্ত। এই পরিস্থিতিতে যেন বন্দীদশার মধ্যে এঁকে যেতে হয়েছে যোগেনকে। দিল্লির সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিও তাঁকে পরিপূর্ণতা দেয়নি। যদিও হয়তো খ্যাতি ও স্বীকৃতি জুটেছে অনেক, শিল্পজগতের বন্ধুবান্ধবেরাও আছেন পাশে, কিন্তু সে তো অন্য কথা। ছবি আঁকার ভেতরের প্রেরণা এই নৈরাশ্যের জগতে কী রূপ নিতে পারে? যোগেনের ছবিতে শৈলীর এই ধরন, বিকৃতিময় আঙ্গিক-উপাদান আরো তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মানুষের পর মানুষ—মিছিল করে আসে তাঁর ছবিতে, কিন্তু তারাও ভাঙাচোরা বিপর্যস্ত ধ্বস্ত। জন্তুর মতো তারা হামাগুড়ি দেয়, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাদের দাম্পত্য ও ভালোবাসাও যেন উপহাসের বস্তু।

এর মধ্যে পরিত্রাণ নেই তা নয়। সর্বব্যাপী ভঙ্গুরতা ও বিকৃতির মধ্যেও সামান্য ইঙ্গিতে ইতিবাচক মনোভাবের জানান দেওয়া থাকে। 'নটী বিনোদিনী' বা 'সুন্দরী'-র মতো শিল্পের দিক থেকে নন্দিত ছবি আঁকা হয়, যেখানে নানা অভিব্যক্তিতে তাঁর সহানুভূতিকে চেনা যায়।

অরুণ সেনের বইটি থেকে এই প্রবন্ধটি নির্মাণ করেছেন তপন ভট্টাচার্য।